দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মোশাররফ হোসেন থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে ধারা প্রবহমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই ধারার এমন একজন কথাকার যিনি পূর্বসুরিদের আত্তীকরণ করেও রাখতে সক্ষম হয়েছেন নূতনত্বের স্বাক্ষর । বিশেষত আবহমানকালের বাঙালি সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের অন্তর্জীবনের ছবি সেভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি । এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর এক ভক্ত পাঠক প্রশ্ন করলে তিনি জানান --

''মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমার দুটো গল্প প্রসিদ্ধ- 'রূপো বাঙাল' ও 'আহ্বান' । আমি আরো গল্প লিখব এদের নিয়ে । কিন্তু উপন্যাস হয় না-- জানো তো ? অর্থাৎ আমার দ্বারা হয় না । মুসলমান সমাজকে আমি কতটুকু জানি; তাদের আচার - বিচার, ধর্মবিশ্বাস এ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে না জানলে তা নিয়ে উপন্যাস লেখা চলে কি ?''[১]

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই শূন্যতাটা বেশ আন্তরিকতা নিয়ে পূরণ করতে চেয়েছেন আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার বা আবু ইসহাক । এছাড়াও রয়েছেন নিজস্ব অবস্থানে সৃষ্টির নির্ঝরধারায়-- সত্যেন সেন । পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তীকালে গৌরকিশোর ঘোষ সেই ঘাটতি পূরণের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং তারপর, কিছুটা সমকালেও বটে; অনেকেই এগিয়ে এসেছেন । কিন্তু এদিক থকে সর্বপ্রথম যিনি পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ।

উপন্যাসের কথায় পরে আসছি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পকার হিসেবে এমন এক সময়ে উঠে এসেছেন যখন বাংলা ছোটগল্প পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে । তিরিশের দশকের গল্পকারদের হাতে বাংলা ছোটগল্প দশায়তনবান হয়ে উঠেছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সামগ্রিকভাবে এদের-ই উত্তরাধিকারী । প্রধানত মনোজগতের রূপকার তিনি । ওয়ালীউল্লাহ্ যে সময়ে লেখা শুরু করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার পূর্বেই সুবর্ণ যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে । ছোট গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের ব্যতিক্রম রূপে দেখা দিয়েছিলেন কল্লোল ও

বিচিত্রা গোষ্ঠীর লেখকেরা । বাংলা ছোটগল্পে পালাবদলের সূচনা ঘটেছে এঁদেরই লেখায় । প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার '(১৯৪৬), তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' (১৯৩৭), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) জগদীশ গুপ্তের 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' (১৯২৯), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দিনমজুর' (১৯৩২) প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), বুদ্ধদেব বসুর 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' (১৯৩২), অন্নদাশংকর রায়ের 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩৫), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘমল্লার '(১৯৩১), মনোজ বসুর 'বনমর্মর' (১৯৩২), প্রবোধকুমার স্যান্যালের 'কয়েক ঘন্টা মাত্র' (১৯৩২), প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' (১৯৪৪) ইত্যাদি গল্পগুলো প্রমাণ করে বাংলা ছোটগল্প সেদিন তার চেনা জগৎ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল অচেনা অজানা বিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্রে । স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দুই দশকে এরা ছিলেন বাংলা ছোটগল্পের ধারক ও বাহক । কিন্তু তবুও এঁদের ছোট গল্পে খুব বেশি মুসলিম সমাজের চিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়নি । এটাই স্বাভাবিক, কারণ বাঙালি মুসলিম সমাজের চিত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখকের পক্ষে সঠিক ভাবে চিত্রিত করা সম্ভব নয় । তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উত্তরসূরি হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন পূর্বসূরির এ দায় নিয়ে । এক্ষেত্রে উল্লেখ্য পূর্বজ এবং সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে তিনি এসেছেন মুসলমান পরিবার থেকে, যিনি এতকাল অরূপায়িত, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা মুসলমান সমাজ জীবনের চিত্রায়নে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চল্লিশের দশকের সাহিত্যে, কবিতায়, কথকতায় সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রী আবহ ছিল সবচেয়ে প্রবল। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র অন্ত্যেবাসী মানুষ বাংলা সাহিত্যে সম্মানের সঙ্গে ও স্বাভাবিকতায় গৃহীত হয়েছিল । প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা'-য় (১৯৪৪) ওয়ালীউল্লাহ্ সমাজের তথাকথিত নিচুতলার জীবনের রূপকার এবং এক-ই সঙ্গে কথাসাহিত্যের কেন্দ্রধর্ম অনুযায়ী সমকালের চিত্রকর । আবার কুঁড়ি বছর পর প্রকাশিত 'দুইতীর'-এ (১৯৬৫) মুসলিম সমাজের মধ্যশ্রেণি ও উচ্চ মধ্যশ্রেণিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । ওয়ালীউল্লাহের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি নিজে ছিলেন উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজের উঁচু তলার মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল । ফলে তাঁর লেখায় আমরা যেমন বাঙালি মুসলিম সমাজের নিচু তলার পরিচয় পাই ঠিক তেমনিভাবে উঁচু তলার জীবনযাত্রার পরিচয়-ও পাই যা বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং সমকালে ছিল দুর্লভ ।

ব্যক্তিগতভাবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নিজের কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না । ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর স্ত্রী অ্যান মারি জানিয়েছেন--

''ধর্ম নিয়ে আমি বা ওয়ালী কোন দিন ভাবিনি''[২]

''ওয়ালী ছিল অবিশ্বাসী , কিংবা বলা যায় অজ্ঞেয়বাদী । তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও মুসলমান হিসেবে গর্ববোধ করত । পশ্চিমা দেশগুলো যখন বর্বর ছিল, তখনকার মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করত । একাদশ শতাব্দীর স্পেনের মতো প্রথম মুসলিম সভ্যতার আদিপর্বের মহত্ব তুলে ধরত ও; একদিকে আলজেরীয় যুদ্ধের কারণে, অন্যদিকে আরবরা সব সময় ইউরোপীয়দের পথের কাঁটা হয়ে থেকেছে বলে ফ্রান্সে যেটিকে ঘৃণার চোখে দেখা হত । (ও এভাবেই ব্যাখ্যা করত), আরবরা প্রাচ্যের সম্পদ মসলা, রেশম প্রভৃতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর এখন লোভনীয় তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর বসে আছে । সালাদিনের মহত্বের কথা বলত ও । আরব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেডের ভিন্ন একটি চিত্র আঁকত ও ।''[৩]

আসলে প্রচলিত ধর্মাচরণে আস্থা না থাকলেও ওয়ালীউল্লাহ্‌ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের জীবনচর্যার একান্ত নিজস্ব চরিত্রকে অস্বীকার করেননি । তাই সচেতনভাবেই তিনি সমকালে সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তারকারি হিন্দু সমাজকে নিয়ে না লিখে মুসলিম সমাজকে নিয়ে লিখেছেন । প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাঙালি মুসলমান লেখকদের লেখার প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথম থেকেই একটা স্পষ্ট প্রতিকৃতি নিজের মত করে তৈরি করে নিয়েছিলেন । তিনি মানতেন সমাজকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় । এ বিষয়ে তিনি জুলাই ১৯৪৩ (২৯ আষাড় ১৩৫০), মাসিক সওগাত পত্রিকার সম্পাদক কাজি আফসার উদ্দিনকে লেখা এক পত্রে জানান--

''আমরা মুসলমান । হয়তো-বা মাত্র কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে । তা ছাড়া যে বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে- সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন আছে কি? এবং সে- সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যর্থতা হবে সেই রকম- ভারতীয় শিল্পকলা ছেড়ে [কোন] কিছুরও মধ্যস্ততা না নিয়ে এক লাফে সুরিয়লিজম শুরু করার যে- ব্যর্থতা । আমার তো তাই মত, তবে সেই মত খণ্ডন করতে রাজি আছি যদি শক্তিপূর্ণ যুক্তি পাই এর বিরূদ্ধে ।''[৪]

তাই তিনি যে মুসলিম সমাজকে নিয়েই লিখবেন একথা স্পষ্ট । তাঁর লেখক জীবনের এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি মাত্র একুশ বছর বয়সে সমসাময়িক এক লেখক বন্ধুকে লেখা এক চিঠি থেকে--

" I want to write মুসলমান সমাজকে নিয়ে -- আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম Passion থেকে সৃষ্ট । মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধ:পতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা-- এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমি আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই । আমার দুয়েকটা গল্প দার্শনিক হলেও আমি দার্শনিক নই । আমি আমার আঁকা ছবিতে সে সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায় ।

পশ্চিম জগত আজ যতটা এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়ত এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমি আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্যে যারা পিছিয়ে আছে । তাতে আমার ক্ষোভ নেই, এতে বড় রকম একটা sacrifice হবে অনেকে বলতে পারেন কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, আছে সেই জ্ঞান যে আমি মানুষ হিসেবে উৎরে গেলাম, ওরাও যুগোপযোগী সাহিত্য পেলো, যে-- সাহিত্যে কিছুটা হয়তো ভবিষ্যতের সোনা ছড়িয়ে থাকলো ।'[৫]

তিনি জানতেন কোন সমাজই ব্যক্তি বিশেষ বা গুটিকতক লোককে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। জাতিকে সম্পূর্ণভাবে এগোতে হলে তার শেকড়কে নিয়েই এগোতে হবে । তা না হলে সেটা 'গাছের গোড়া কেটে আগায় জল সিঞ্চন'-- এর মতই এক ব্যর্থ ক্রিয়াতে পরিণত হবে ।

ওয়ালীউল্লাহ্-র বহু গল্পে বাঙালি মুসলিম সমাজের সামন্ত-- বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া-- মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে সামন্ত-মুৎসুদ্দী সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য । পুরুষ সেখানে প্রভু, স্বার্থপর, লোভী এবং স্বেচ্ছাচারী, আর নারী নির্যাতনের পাত্রী । কখনও সেবিকা আবার কখনও বা দেবী নামে সম্মানিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সংসারে তার স্থান দাসীর চেয়ে খুব বেশি উচ্চ স্তরে নয় ।

প্রকৃতার্থে এর বীজ নিহিত রয়েছে মুসলিম ধর্মেরই কিছু অমানবিক নিয়মের মধ্যে । পৃথিবীর আর পাঁচটা ধর্মের মতই মুসলিম ধর্মেও নারীর অবস্থান খুব বেশি সম্মানজনক নয়। কোরান অনুযায়ী--

''একজন পুরুষ দুজন নারীর সমান । তোমাদের পছন্দ মতো দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক''[৬]

বৈবাহিক ক্ষেত্রেও এ দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায় । মুসলিম ধর্ম অনুযায়ী একজন পুরুষ একই সঙ্গে একাধিক নারীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একজন নারী যদি একই কাজ করে তবে তাকে দুশ্চরিত্র অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে । শুধু তাই নয় এ কাজের জন্য তার প্রাণ সংশয়ও হতে পারে । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উদারমনস্ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নারীদের প্রতি এ অসম্মান কখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেননি । তাই তাঁর বিভিন্ন লেখায় আমরা বারবার এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি উচ্চারিত হতে দেখি শ্লেষ ও বিদ্রুপ আর নারীর জন্য সহমর্মিতা ও সম্মান । তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনায় মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঠিক কতটা উঠে এসেছে বা লেখক কতটা সার্থকভাবে তাঁর সাহিত্যে সেই চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন তা বিশ্লেষণ করার পূর্বে আমরা একটু দেখে নেব ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু মূল বৈশিষ্ট্যকে।

ধর্ম হিসেবে ইসলাম :

ইহুদি এবং খ্রিস্টানধর্মের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মের বিকাশ । ইসলামের অনুসারীরা অবশ্য বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে মনুষ্যপ্রজাতির আবির্ভাবের পর থেকেই শুরু হয়েছিল ইসলাম ধর্ম । বাইবেলে যে আদি মানব আদমের কাহিনি আছে, তাঁর আচরিত ধর্মকেই ইসলাম ধর্ম বলে তাঁরা দাবি করেন । তাঁদের মতে ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং এধরণের আরো অন্যান্য ধর্মও আদিতে ছিল ইসলাম ধর্ম । আর এসব ধর্মের প্রবর্তকেরাও ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত দূত । কিন্তু কালক্রমে অনুরাগীদের দ্বারা ধর্মগুলি বিকৃতি লাভ করায় আল্লাহ্ তাঁর শেষতম পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ রূপ প্রচার করেন বলে এই ধর্মের অনুসারীরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন । সেই অর্থে হযরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, প্রচারক মাত্র ।

'ইসলাম' একটি আরবি শব্দ ।ইসলাম অর্থ সমর্পণ, শান্তি । এক ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা, এক ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকার বিধানকে একাগ্রতার সঙ্গে মেনে চলার জন্য আত্মোৎসর্গ করে আত্মসমর্পণ করাই হল ধর্মীয় অর্থে ইসলাম । ইসলাম ধর্মের বিধানে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় । তিনি কারও দ্বারা সৃষ্ট নন , কোন কিছু দ্বারা সৃষ্ট নন , তিনি নশ্বর নন, অবিনশ্বর । ইসলাম ধর্মে নিরাকার ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য । ইসলাম ধর্ম

মতানুযায়ী হযরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্মের শেষ পয়গম্বর বা ঈশ্বরের দূত । তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ সংস্কারক হিসেবে ইসলাম ধর্মকে সুনির্দিষ্ট পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন । এগুলো হল --

১. কালেমা বা বাক্য

২. সালাত বা নামায

৩. সিয়াম বা রোজা

৪. যাকাত

৫. হজ্ব

কালেমা বা বাক্য : কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে কয়েকটি বাক্য মুখে উচ্চারণ করতে হয় এবং অন্তর থেকে সেই বাক্য বিশ্বাস ও সেই মত পালন করতে হয় যাকে বলা হয় কালেমা । কালেমা-টি হল-

''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুরুল্লাহ্''

বাংলা অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ।

সালাত বা নামাজ : মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের দিনে রাতে মিলিয়ে পাঁচবার নামাজ আদায় করতে হয় এবং জুম্মা বার অর্থাৎ শুক্রবার ও দুই ঈদের সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হয় ।

সিয়াম বা রোজা : রোজাকে কোরানে বলা হয়েছে 'সওম' । সওম অর্থ বিরত থাকা বা বিরত রাখা । রোজার দিনে মুসলমানগণ কোন জিনিস খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকেন । এই সওম বা সিয়াম পালন করা হয় রমজ্বান মাসে । সূর্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ফজরের আযান থেকে মাগরিবের আযান - এ সময়টুকু পর্যন্ত রোজার সময় । রোজার সময় শুরুর আগে শেষ রাতে যে খাবার খাওয়া হয় তাকে সেহেরী বলে ।

রমজান মাস যেভাবে গণনা করা হয় : রমজান চান্দ্র বছরের একটি মাসের আরবি নাম । মুসলমানগণ চাঁদের নিয়মে মাস ও বছর গণনা করে থাকে । একটি চান্দ্র বছরে থাকে ৩৫৪ দিন এবং সৌর বছরে ৩৬৫ দিন । অর্থাৎ সৌর বছর অনুযায়ী চান্দ্রমাস প্রতিবছর একই সময়ে পড়ে না । বছরে ১১ দিন এবং লিপইয়ার হলে ১২ দিন এগিয়ে আসবে । ফলে

কোনো বছর শীতকালে, কোনো বছর গরমকালে অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুতে রমজান মাস এসে থাকে।

যাকাত : ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হল যাকাত । যে কোন মুসলমানের সারা বছরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ বৎসরকাল যাবৎ উদ্বৃত্ত থাকে তার জন্য ঐ সম্পদ বা সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করে দেওয়া বাধ্যতামূলক । এই দান করাকেই বলা হয় যাকাত ।

যে যে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হয় : নগদ টাকা, ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধন ও ব্যবসার সামগ্রী, অলঙ্কার, গবাদি পশু এবং ক্ষেতের ফসলের জন্য যাকাত দিতে হয় । যাকাতের নিয়ম হল বছরের শেষে সব রকম জরুরি খরচের পর যার কাছে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপোর মূল্যের সমান টাকা থাকে তাকে যাকাত দিতে হবে । যাকাত দিতে হবে নগদ টাকায়, কমপক্ষে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে । যে সকল সম্পদের উপর যাকাত দিতে হয় তাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় । প্রথম শ্রেণির সম্পদের মধ্যে পরে সোনা, রূপা এবং নগদ টাকা । দ্বিতীয় শ্রেণির সম্পদ হল তেজারত ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত মালপত্র এবং তৃতীয় শ্রেণির সম্পদ হিসেবে ধরা হয় গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি । এই তিন শ্রেণির সম্পদের জন্যই যাকাত দান বাধ্যতামূলক ।

হজ্ব : ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের শেষ স্তম্ভ হল হজ্ব । 'হজ্ব' একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া । ইসলাম ধর্মে হজ্ব বলতে বোঝায় জিলহাজ মাসে আরব দেশের মক্কা নগরে অবস্থিত কাবা ঘরে পৌঁছানো । সেখানে যাওয়ার পর কতগুলি আচার অনুষ্ঠান করতে হয় । সেগুলো হল--

১. এহরাম

২. তাওয়াফ

৩. সায়ী

৪. মিনায় রাত্রিবাস

৫. আরাফাতের অবস্থান ও দুই একামতে একত্রে জোহর ও আস্বরের সালাত পাঠ ও প্রার্থনা

৬. মুযদালেফায় ফিরে রাত্রি কাটানো

৭. কোরবানী ও মিনায় শয়তানকে কাঁকর মারা

৮. সবশেষে কাবা ঘর তাওয়াফ করা ও সাফা মায়ওয়ায় সায়ী করা

- এইসব কাজগুলি কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী করা হয় ।

এহরাম বলতে যা বোঝায় : মক্কার নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছনোর পর প্রত্যেক হাজ্বীকে এহরাম শুরু করতে হয় । এহরাম শুরু করার অর্থ হল হজ্ব পালনের ইচ্ছা ঘোষণা করা অর্থাৎ বেশ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা । এহরামের পরই শুরু হয় হজ্ব যাত্রা । এহরাম শুরু করতে হলে প্রথমে স্নান করে নিতে হয় । তারপর পুরুষদের বিশেষভাবে একটি সাদা কাপড় পরতে হয় ও একটি গায়ে দিতে হয় । মহিলাগণ নিজেদের পোশাক পরিধান করেন কিন্তু মুখ খোলা রাখেন । এহরাম শুরু করার অর্থ ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ । এহরাম শুরু করার পর কোন খারাপ কাজ বা খারাপ চিন্তা করা যায় না । হৃদয়ে সকল সময় শান্ত, সুন্দর পবিত্রভাব রাখতে হয় । এহরাম অবস্থায় কোন খারাপ কথা বলতে নেই , ঝগড়া করতে নেই, কোন প্রাণীকে আঘাত করতে নেই, গাছের পাতা ছিড়তে নেই বা ডাল ভাঙতে নেই । কেবলমাত্র বাইরের নিয়ম-কানুন নয় মনে মনেও একমাত্র ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে হয় । হজ্বের অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করে, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয় ।

তাওয়াফ বলতে যা বোঝায় : কাবা শরীফের কাছে পৌঁছেই হাজীগণ নির্দিষ্ট দোয়া পড়েন ও কাবার চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন । একেই বলা হয় তাওয়াফ । কালো পাথর থেকে এই প্রদক্ষিণ শুরু হয় । ঐতিহাসিক কালো পাথরকে চুমু দিয়ে অথবা তা স্পর্শ করে কিংবা তার দিকে হাত তুলে এই প্রদক্ষিণ শুরু করা হয় ।

সায়ী বলতে যা বোঝায় : সায়ী অর্থ জোরে হাঁটা । হাজ্বীগণকে কাবার পূর্বদিকে উত্তর দক্ষিণের দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ার পথে জোরে হাঁটতে হয় সাতবার । একেই বলা হয় সায়ী । হযরত ইব্রাহীম তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে ঈশ্বরের আদেশে মক্কার ধূসর মরুভূমির বুকে রেখে গিয়েছিলেন । মরুভূমির তীব্র সূর্যকিরণে দগ্ধ পাথুরে মৃত্তিকায় শায়িত শিশু পিপাসায় ছটফট করছিল । মাতা হাজেরা পাগলিনীর মত জলের সন্ধানে একবার সাফা পাহাড়ে উঠছেন - আবার নেমে দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠছেন । কোথাও কোন জলের সন্ধান ছিল না । এভাবে তিনি সাতবার ঐ দুটো পাহাড়ে উঠেছিলেন । জলের জন্য বিবি হাজেরার এই দৌড়াদৌড়িকে স্মরণ করে প্রত্যেক হাজীগণকে সাতবার সাফা পাহাড়ে উঠতে হয় । একেই বলা হয় সায়ী ।

আরাফাতে অবস্থান বলতে যা বোঝায় : ৯ ই জিলহাজ্ব সকালে হাজ্বীগণ মীনা থেকে আরাফাতে পৌঁছান । সেখানে যোহরের নামাজ একসঙ্গে আদায় করতে হয় । সূর্যাস্তের পর

পর্যন্ত এখানে নামায ও প্রার্থনা করার পর তাঁবু উঠিয়ে মুদালেফায় পৌঁছতে হয় । সেখানে মাগরিবের পর পর্যন্ত আরাফাত প্রান্তরে থাকাকে আরাফাতে অবস্থান বা ওকুফ করা বোঝায় ।

মিনায় শয়তানকে কাঁকড় মারা ও কোরবানী করা : এরপর হজ্ব যাত্রীগণ মিনায় ফিরে আসেন এবং শয়তানকে কাঁকড় মেরে সৎকাজে দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞা করেন । ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোরবানী দেন । কোরবানীর পর তাঁরা মাথার চুল কামান । ১০ই জিলহ্বাজ অথবা পরের দিন হাজ্বীদের আর একবার কাবা প্রদক্ষিণ করতে হয় । মিনাতে কমপক্ষে তাদের দুদিন থাকতে হয় । মিনায় তিনটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে সেখানে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছুড়ে মারেন হাজীরা । হযরত ইব্রাহীম যখন তার পুত্র ইসমাইলকে কোরবানীর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যে তিন জায়গায় শয়তান ধোঁকা দেওয়ায় তিনি তাকে পাথর ছুড়ে মেরেছিলেন সেই তিন জায়গাকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে । হাজীগণ মনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে এখানে পাথর মারেন । তবে সকলেই চাইলে হজ্ব করতে যেতে পারেন না । কোন ব্যাক্তি হজ্ব করতে চাইলে তাকে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে--

সম্পদশালী হওয়া: যারা হজ্ব করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে হজ্বের সফরের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন ছাড়াও বাড়িতে ফেরত আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনদের ন্যূনতম যাবতীয় খরচ-খরচা বহনের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন । এছাড়া ঋণগ্রস্ত না থাকা, ঋণ থাকলেও তা পরিশোধের পরও হজ্বের খরচের পরিমাণ টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : হজ্ব করতে হলে কোন ব্যক্তিকে সাবালক হতে হবে ।

সুস্থ ও সবল হওয়া : হজ্ব কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ পথযাত্রার বিষয় । হজে গমনকারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে । নইলে সার্বিক পদ্ধতিতে হজ্ব সম্পন্ন হবে না । শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ না হলে সম্পদশালীকে বদলী হজ্ব করানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

বৈধ অর্থ হওয়া প্রয়োজন : হজ্বের প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে উপার্জিত হওয়া প্রয়োজন। অসৎ পথে, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ হজের কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ ।

একান্ত একাগ্রতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন : হজ্বে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে । নিজের মনপ্রাণকে পার্থিব ভোগ-লালসা ও কামনা মুক্ত রাখতে হবে ।প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের জন্য সামান্যতম অনুশোচনা ও দুঃখ বা গর্ব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখে একাগ্র চিত্তে নিজেকে তৈরি করতে হবে ।

স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়া : কোনো লোক পরনির্ভর হলে কিংবা পরাধীন চাকর, যার নিজের সিদ্ধান্তে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই তার জন্য হজ্ব করা বাধ্যতামূলক নয় ।

হজ্বের যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া : যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যদি হজ্বের স্থানে বা হজ্বের কার্য সমাধা করার পথে চলতে থাকে তাহলে পথ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হুজে যাওয়া স্থগিদ রাখতে হবে ।

স্ত্রীলোকদের সঙ্গী থাকা প্রয়োজন : মহিলারা হজ্বে গেলে তাদেরকে সঙ্গী নিতে হবে । এক্ষেত্রে পিতা, স্বামী বা পুত্র সঙ্গী হতে পারবেন । অথবা এমন লোককে সঙ্গী নিতে হবে যার সঙ্গে ঐ মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ ।

মৃতের পক্ষে হজ্ব : কোন সম্পদশালী নারী-পুরুষ কোন কারণে জীবিতকালে হজ্ব করতে না পারলে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারীশকে তার সম্পত্তি থেকে বদলি হজ্ব করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

ধর্মগ্রন্থ : ইসলাম ধর্মে মোট ১০৪ টি ধর্মগ্রন্থের কথা বলা হয় । তবে তাদের মধ্যে চারটি ছাড়া বাকি গ্রন্থগুলোর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । সেই চারটির মধ্যে তিনটি আবার খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত । গ্রন্থগুলো হল--

১. তাওরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট)

২. ইনজিল (নিউ টেস্টামেন্ট)

৩. যবুর (স্যাম-ইহুদী ধর্মগ্রন্থ)

৪. কোরান

বর্তমানে মুসলিমরা শুধু কোরানকেই তাদের বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মনে করে । মুসলিমরা মনে করে কোরান পৃথিবীতে যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিল ঠিক তেমনি আছে । এর রূপের কোন পরিবর্তন হয় নি । তবে তাদের এই দাবি কতটা যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে ।কারণ হযরত মহাম্মদ নিজে ছিলেন নিরক্ষর । তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ তাঁর সঙ্গী-সাথিদেরকে বিভিন্ন সময়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সঙ্গে সঙ্গে কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি । তাঁর অনুগামীরা শুধু সেই সকল বাণী মুখস্ত করে রাখতেন । হযরত মোহাম্মদের জীবিতকালে কোরান শরীফ সুবিন্যস্ত আকারে লিখিতভাবে বজায় ছিল না । কোরান শরীফ লিখিতভাবে সাজানো হয় হযরত ওমর-এর সময় থেকে ।

ইসলামি শরিয়ত :

শরিয়ত কথাটির অভিধানিক অর্থ হল মেনে চলার সুনির্দিষ্ট পন্থা বা বিধান । শরিয়ত হল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের এক অবশ্য পালনীয় বিধান ।শরিয়তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিধি ও সমস্ত কর্মাচারণ । আধুনিক আইনের সংজ্ঞায় শরিয়তকে ঠিক আইন বলা উচিত হবে না । শরিয়ত হল এক ধর্মীয় ও নৈতিক পথ নির্দেশিকা । শরিয়তের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে অত্যাবশকীয় পাঁচটি ধর্মীয় হুকুম ক্রিয়াশীল :

১. **'ফার্‌জ্‌'** - অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ কায়েম করা আবশ্যিক- যথা 'ফজর' (প্রত্যুষ), 'জুহুর' (দুপুর), 'আছর' (বিকাল), 'মগ্‌রেব' (সন্ধ্যা) এবং 'এশা' (রাতের প্রথমভাগ) ।

২. **'হারাম'** - নিষিদ্ধ নির্দেশ । এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যেক মুসলমানের কাছে চিরকালই হারাম বা নিষিদ্ধ । যেমন মদ খাওয়া, সুদ খাওয়া, শুকরের মাংস খাওয়া, একই ঔরসজাত ও গর্ভজাত সহোদর বা সহোদরাকে বিয়ে করা ।

৩. **'মুনদাব'** - অতিরিক্ত নামাজ কায়েম করা । ফার্‌জ পালনের মতই ঈদ্‌-উল-ফিতরে একমাস রোজা বা উপবাসের পর এবং ঈদ্‌-উল-আজ্‌হা, কোরবানীর পর নামাজ কায়েম করা শরিয়তি বিধান ।

৪. **'মুকরুহ্‌'-** ঔচিত্যগত নিষেধাজ্ঞা । সহি হাদিসে বলা হয়েছে যে মুসলমানদের কিছু কিছু ভোগ্যদ্রব্য খাওয়া উচিত নয় । যেমন- কাঁকড়া, কাদা মাছ বা সাপ জাতীয় মাছ ইত্যাদি ।

৫. **'জায়েজ'** - নিরপেক্ষতা, গতানুগতিকতা । কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে কোরান এবং হাদিস নীরব থেকেছে অর্থাৎ কোন নির্দেশ দান করে নি । যেমন আকাশ পথে ভ্রমণ বা সমুদ্রপথে ভ্রমণ ইত্যাদি । উল্লিখিত বিষয়গুলোর সবই শরিয়ত ভুক্ত ।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর সঙ্গ দ্বিতীয় দফায় যুক্ত হয়েছে আরও কিছু অত্যাবশকীয় বিষয় যেগুলো শরিয়তকে বিশেষভাবে ঋদ্ধ করেছে । সেগুলো হল :

৬. **'ফিকাহ্‌'** - বোধশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা বা বিবেক প্রয়োগ ক্ষমতা । ফিকাহ্‌ তত্ত্ব শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । ফিকাহ্‌কে বাদ দিলে শরিয়ত অর্ধসত্য হয়ে পড়ে । কোরান ও হাদিসে যে যে বিষয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কোনো কিছুই যেখানে বলা নেই, সে সে বিষয়ের ভাল-মন্দ নিরূপিত হয় বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বা বিবেক প্রয়োগের মাধ্যমে । মুসলিম সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধ

আলেমগণ তাঁদের বোধশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিষয়ের ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন । ফিকাহ্ বা ইলম্-উল্-ফিকাহ্ তত্ত্বকে আরও সহজভাবে প্রয়োগের জন্য --

ক. ইলম-উল-ফাতোয়া - অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেবার বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতা ।

খ. ইলম্-উল্ফারাইজ - অর্থাৎ অভিজ্ঞতা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, বোধ এবং বিবেক প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে । অতীতে কোন অনুরূপ বিষয়ে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাও দেখা হয় এবং অতীত রায় নিষ্পত্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় । তাই ইলম-উল-ফিকাহ হয়ে উঠেছে শরিয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ।

এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ইলম্-উল্-ফিকাহ - এর সঙ্গে শরিয়তের যে সূক্ষ পার্থক্য আমরা দেখি তা হল এদের প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিধি । শরিয়তের বৃত্তের পরিধি সমগ্র মুসলিম সমাজে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় আর ফিকাহ্-এর প্রয়োগ ক্ষেত্র কেবল আইনগত বিষয় । কোরান ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শরিয়ত আর ফিকাহ্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সব বিষয়ে যা কোরান ও হাদিসে উল্লেখ করা নেই । মুসলিম সমাজের শরিয়তি আইনের উৎস এই শরিয়ত এবং ফিকাহ্ তত্ত্বের মিশ্রণ । তাই ফিকাহ্ শরিয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে স্বীকৃত ।

ফিকাহ্-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আরও তিনটি বিষয় শরিয়তকে পুষ্ট করেছে :

১. ইজ্মা - বিবেক প্রসূত ঐক্যমত । হযরত মোহাম্মদের জীবনকালে তাঁর সাহাবী বা অনুচরেরা বিবেকপ্রসূত ঐক্যমত দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় যেভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন সাধারণ মানুষের অধিকাংশের ঐক্যমতের উপর নির্ভর করে-তাই হল ইজ্মা ।

২. কিয়াস - সাদৃশ্য-অনুমান । পূর্ব ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শরিয়ত মোতাবেক বলে দাবি করা হয় ।

৩. সুন্না বা সুন্নত - হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত অবলম্বনে চলাকে সুন্নত বলা হয় । যেমন-পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনা ইত্যাদি ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো একত্রিত করলে যে অবয়ব পাওয়া যায় তাই হল শরিয়ত ।

শিয়া-সুন্নি :

মুসলিম ধর্মে প্রথম দিকে কোন জাতিভেদ প্রথা বজায় ছিল না । কিন্তু হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার নির্বাচন নিয়ে মতান্তর থেকেই মুসলমানদের মধ্যে 'শিয়া' এবং 'সুন্নি' ভেদাভেদের উদ্ভব । ইসলামের ইতিহাসে যেমনটি ঘটেছে, অর্থাৎ

মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের অনুগামীদের নেতৃত্ব বর্তেছিল প্রথম খলিফা আবু বকরের উপর, তিনি মোহাম্মদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন । এইভাবেই পর পর চারজন খলিফা নির্বাচিত হয়ে তৎকালীন মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । সুন্নিরা এই পদ্ধতির মধ্যে কোন ভুল আছে বলে মনে করেন না । সুন্নি শব্দের অর্থ সুন্নতের অনুসারী । 'সুন্নত' বলতে মোহাম্মদের নীতি ও আদর্শ কিংবা তাঁর সৃষ্ট ট্র্যাডিশনকে বুঝিয়ে থাকে । মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিদের সংখ্যাই বেশি । শিয়ারা তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠী । শিয়ারা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্ণয়ের উল্লিখিত পদ্ধতি অনুমোদন করে না । তাঁরা মনে করে মোহাম্মদের পরেই নেতৃত্বের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ছিল হযরত আলির । কারণ তিনি মোহাম্মদের পরিবারের সদস্য ছিলেন । তাই নেতৃত্বের ঐশ্বরিক মহিমা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর উপরেই বর্তানোর কথা । শিয়াদের মতে পরবর্তী পর্যায়েও মোহাম্মদের কন্যা ফতিমা এবং তাঁর স্বামী আলির বংশোদ্ভূতরাই কেবলমাত্র নেতৃত্বের ঐশ্বরিক মহিমার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন । সেই কারণে শিয়ারা মোহাম্মদ-পরবর্তী পর্যায়ে কেবলমাত্র আলি এবং তাঁর বংশধরদের ইমাম বা নেতা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন । শিয়া শব্দের অর্থ দল, শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'শিয়া-ইত-ই আলি' বয়ান থেকে । এরা হযরত আলির দল । সারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইরানেই শিয়ারা সুন্নিদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ।

যাইহোক পূর্বেই বলেছি ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিভিন্ন গল্পে অন্তপুরবাসিনী মুসলিম নারীদের কথা উঠে এসেছে । ওয়ালীউল্লাহ্‌-র এমন-ই একটি গল্প 'পাগড়ি' । গল্পটিতে উকিল খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি, যিনি স্বার্থপর, লোভী এবং স্বেচ্ছাচারী। স্ত্রীকে তিনি সারাজীবন ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করেছেন । অথচ সেই স্ত্রীর যখন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তখন তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করে মনে মনে ভাবেন -

''বাইরে তাঁর কর্মবহুল জীবন তাঁকে যশ - মান - অর্থ দিলেও তার ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছে । তাঁর প্রধান কারণ তার স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ।''[৭]

শুধু তাই নয় ঘরে বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রী ও ছয়টি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে তিনি স্থির করেন পুনরায় দারপরিগ্রহ করবেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দেন তা অত্যন্ত হাস্যকর -

''তিনি তাঁর বয়সের কথা ভাবেন । তাঁর সমগ্র মাথায় আজ পক্ককেশ, কিন্তু তার জন্যে বয়সকে দোষ দেওয়া যায় না । বিস্তারিত ওকালতি ব্যবসা সৃষ্টি করবার জন্য যে -

কঠোর শ্রম করেছেন বছরের পর বছর, সে - শ্রমই পক্বকেশের জন্য দায়ী । পক্বকেশ মিথ্যার একটি প্রলেপ মাত্র । এ কথা ঠিক যে, যারা তাঁর বয়সের কথা জানে না এবং চুলের অকালপক্কতার খোঁজ রাখে না, তারা তাঁকে বৃদ্ধ বলেই মেনে নেয় । তাঁর বৈঠকখানায় যে মক্কেলের ভিড় তার প্রধান কারণও ঐ শুভ্রতা , চুলের বর্ণহীন রুপালি বিন্যাস । তারপর তাঁর বড়-বড় ছেলেমেয়েদের দেখেও তাঁর বয়স সম্বন্ধে ভুল হওয়া স্বাভাবিক । তবে তার কারণ এই যে, অল্প বয়সে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি বিয়ে করতে দু-দণ্ড সবুর করেন নাই । বয়সের বাহ্যিক এ - সব চিহ্ন থাকলেও তাঁর বয়স বেশি নয় । তিনি বয়সের ভার তো বোধ করেনই না, তিনি যুবকের তেজ - বলের অধিকারী বলেই মনে করেন । এখনো তাঁর শরীরের বাঁধন শক্ত, তাঁর মেরুদণ্ড ঋজু । তাঁর দেহে এখনো শক্তি আছে , মনে আশাও আছে । ভবিষ্যৎ তাঁর চোখে এখনো ছায়াময় হয়ে ওঠে নাই ।

এ পর্যন্ত ভেবে মোত্তালেব সাহেব থামেন । তিনি উকিল মানুষ । সারাজীবন দেয়ালের আলমারিতে ঠাসা আইনের কেতাবগুলি কোরানের মতো হেফজ করেছেন । কাজেই কোনো কথা তলিয়ে বা নজির খতিয়ে বিচার না করে দেখলে মনে শান্তি পান না । তাই সত্যসন্ধানীর অদম্য উৎসাহ নিয়ে কথাটা গোড়া থেকে আবার ভেবে দেখেন । অবশেষে তিনি নিঃসন্দেহ হন যে , তাঁর মাথাটা সাদা হলেও এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা বড়সড় হলেও তাঁর বয়সটা তেমন নয়।’’[৮]

গল্পের ক্লাইম্যাক্স চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যখন মোত্তালেব সাহেব নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন । গভীর রাতে প্রবল বর্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরে দরজায় করাঘাত করলে চক্ষুলজ্জার কারণে ছেলেমেয়েরা কেউ দরজা খুলতে এগিয়ে আসে না । চাকর গভীর ঘুমে অচেতন আর ঝি -র শ্রবণশক্তি নেই বললেই চলে । ছেলেমেয়েরা তা জানলেও কেউ এগিয়ে আসে না । অবশেষে -

‘‘পাগলী মা-ই দরজা খোলেন -তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বৃষ্টির দিকে যেন তাকান, তারপর আপন মনে একবার হাসেন । অবশেষে অকারণে মুখ ব্যাদান করে ভেতরে চলে যান, একবার দেখেনও না কে এসেছে না এসেছে ।’’[৯]

তাঁদের পাগলী মা হয়ত সেদিন অর্ধ - সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন, যা তিনি মাঝে মাঝেই ফিরে পেতেন । তাই হয়তো তার হাসি অনর্থক নয় । চিরন্তন পুরুষ শাসিত সমাজে এ এক বিদ্রুপের হাসি । আর যিনি হাসলেন তিনি সর্বংসহা ও ক্ষমাশীল নারীর প্রতিমূর্তি ।

মোত্তালেব সাহেবের মত আরেক চরিত্র মুনসেফ খান সাহেব বদরুদ্দিনকে আমরা পাই 'মৃত্যু' গল্পে । গল্পে আমরা দেখি বদরুদ্দিন সাহেব ও আমেনা খাতুনের ভালোবাসাহীন, বহুসন্তানময় দাম্পত্য জীবনের শেষে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই । স্ত্রী আমেনা খাতুন জানেন না তার স্বামী বৈঠকখানায় কী করেন, বা বাইরে ঝোলানো সাইনবোর্ডটিতে কী লেখা আছে । শুধু জানেন নিজে জীবনে কোন দিন শান্তি পাননি । তার জানার সময়ও অবশ্য ছিল না, কারণ --

''প্রতি বৎসর সন্তান জন্মলাভ করার ফলে বেচারি হাঁফ ছাড়বারও ফুরসত পাননি, একটি বুকের দুধ খেয়ে একটু হাঁটি - হাঁটি পা- পা করতেই হঠাৎ ট্যা করে চোখ - বোজা মাংসের পিণ্ড আরেকটি অতিথির আগমন হয়েছে । কাকে রেখে কাকে নেন, আবার কাউকে রেখেও চলে না''[১০]

এভাবে এলোমেলো, দিশেহারাভাবে দিনগুলো কাটিয়ে একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন তার জীবনের যেন কোনো অর্থ নেই । আর এ জন্য তিনি দায়ী করলেন স্বামী বদরুদ্দীন সাহেবকে-

''তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মাল ঃ *তাঁর স্বামী, যার সঙ্গে তিনি এতদিন ঘর করেছেন, তিনি তাঁর জন্য খোদার এ- সুন্দর দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যত কিছু সুকোমল ও মাধুর্য সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন ।''*[১১]

অপরপক্ষে বদরুদ্দীন সাহেবেরও ঠিক একই ধারণা । তিনি মনে করেন --

''তাঁর স্ত্রী, আমেনা খাতুন, তাঁর জীবনকে ছারখার করে দিয়েছেন । আইনি বুদ্ধিতে এ - যুক্তির সমর্থন নেই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস হল ঃ তাঁর জীবন যে সফলতায় মন্ডিত হয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে নি তার প্রধান কারণ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারায় বোনা শীর্ণ আমেনা খাতুন যাঁর দেহের তোরণ - পথে এতগুলো সন্তান এ-- বিচিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে''[১২]

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তিনি কিন্তু নিজের সন্তানদের ঘৃণা করলেন না, করলেন শুধু সন্তানদের সাদি - আয়াকে । ঘৃণা করলেন মনে - প্রাণে বিষাক্ত হিংসাত্মক ক্রোধে । আর এ ক্রোধের এমনই আগুন যে -আমেনা খাতুন যখন অসুস্থ হন তখন ছেলেমেয়েরা মায়ের অসুখের কথা বললে-- 'ও-সব তোর মায়ের পেকনাই' বলে তাড়িয়ে দেন । বস্তুতপক্ষে আমেনা খাতুনের মৃত্যুও হয় স্বামীর অবহেলার কারণে । তবুও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি যে স্বামীকে ক্ষমা করে যান এতে তার মহত্বই প্রকাশিত হয়েছে ।

'পাগড়ি' গল্পের মত 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' এবং 'সতীন' গল্পেও ওয়ালীউল্লাহ্ মুসলিম সমাজের বহুবিবাহপ্রথাকে তুলে ধরেছেন । আবার 'বংশের জের' গল্পে বহুবিবাহ প্রথার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছেন তা হল বর্ণবৈষম্য প্রথা । মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ প্রথা নেই বলে যে কথাটি চালু রয়েছে তা সত্য নয় । ইসলাম -ধর্ম বর্ণবৈষম্যের বিধান অনুমোদন করে না এ কথা ঠিক হলেও মুসলমান সমাজে উঁচু এবং নিচু জাতের বৈষম্য পুরোপুরি উপস্থিত । এক্ষেত্রে তথাকথিত উঁচু জাতকে আশরাফ এবং নিচু জাতকে আতরাফ বলা হয় । গল্পে আমরা দেখি আতরাফ জাতের মেয়ে আনিসার বিয়ে হয় আশরাফ পরিবারের ছেলে কমরের সাথে, যে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বংশ রক্ষা করা । কারণ আশরাফ বংশের ছেলে কমর মানসিক বিকারগ্রস্ত । অথচ এ কথা গোপন রেখে তারা কমরের পরিচয় দেয় আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে । স্বাভাবিকভাবেই আনিসার দাম্পত্য জীবন বলে কিছু থাকে না । উপরন্তু তাকে আবদ্ধ থাকতে হয় নানা বাধা - নিষেধের ঘেরাটোপে । কোথাও একচুল এদিক - ওদিক হলে তার জন্য বরাদ্দ থাকে শাস্তি । আনিসাকে শাসন করতে গিয়ে তার দাদি-শাশুড়ি (ঠাকুমা শাশুড়ি) বলেন--

''দেখ, ছোটজাত বড়জাতের কথাটা বড় খাঁটি । তেল পানির মত দুটো ফারাক্ থাকবে সব সময়ই । এ দুই জাত মিশ খায় না । তুমি কি আর আমাদের বাড়ির মর্যাদা বুঝবে?''[১৩]

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিশেষ কিছু অবশিষ্ট না থাকলেও বংশের গৌরব আনিসার শ্বশুরেরও কিছু কম নেই--

''তিন ইঞ্চি উঁচু মস্ত খড়মে খটখট করে হাঁটেন ইনতেসার সাহেব, আনিসার শ্বশুর । তোমদানের মতো তৈজি এখনো শূন্য না হলেও কিছু জমাজমি তালুক - সম্পত্তি এখনো আছে । তাই শরিক আছে । ইনতেসার সাহেব সাত আনার শরিক । কাজেই উত্তর ঘরেই হোক আর দক্ষিণ ঘরেই হোক তিনি যখন হাঁটেন তখন কাউকেই তোয়াক্কা করে হাঁটেন না । বিয়ের পর প্রায় এক বছর তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে আনিসার বুক কাঁপত ধপ-ধপ করে। এখন কেবল ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে । শ্বশুরের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। তাই আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় তখন মনে হয় একটা জিন চলে গেল ।''[১৪]

প্রকৃতপক্ষে আনিসার এই দাদিশাশুড়ি এবং শ্বশুর তথাকথিত উঁচু - বংশের মানুষের অর্থহীন অহংকার, অমানবিক আচার-বিচার, অন্তঃসারশূন্যতা আর মিথ্যাচারের প্রতীক।

অধঃপতনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেও এক শ্রেণির আশরাফ মানুষের খলতার এক দুধর্ষ চিত্র এ গল্প ।

'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পটিতে বিশ্বাস, কল্পনা, লোকপুরাণ এবং কুসংস্কারের সংমিশ্রণে ধর্মের শাসনের এক জটিল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যার বলি হয়েছে এক ন-বছরের বালিকা সেলিনা । নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আম- মৌলবি সেলিনার শৈশবকে চিরদিনের মত নষ্ট করে দেয় কুসংস্কারের আবরণ দিয়ে। এক শিশুর পক্ষে নানা জিনিস কল্পনা করাই স্বাভাবিক । সেলিনাও তাই করেছিল । গ্রীষ্মের ছুটিতে সে বেড়াতে এসেছিল তার দাদাসাহেবের বাড়ি । দাদাসাহেবের বাড়িতে বেড়াতে আসার দু -দিন পরেই গ্রামে একটি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় । সন্ধ্যার প্রাক্কালে দাদাসাহেবেরই প্রজা তারা মিঞা তার ছোটভাই সোনা মিঞাকে কোঁচবিদ্ধ করে খুন করে। আর নির্মম এই ঘটনাটি ঘটে তুচ্ছ একটি দু-আনা পয়সা নিয়ে । খবর পেয়ে দাদাসাহেব যখন সদলবলে তারা মিঞার বাড়িতে উপস্থিত হন তখন নয় বছরের বালিকা সেলিনাও যে তার পশ্চাদানুসরণ করেছে তা তিনি লক্ষ্য করেননি । তারপর এক সময়ে লণ্ঠনের আলোয় লেপাজোকা পরিচ্ছন্ন উঠানে গরু বাঁধা খুটির পাশে পড়ে থাকা চৌকোণা দু'-আনার মুদ্রাটি দেখতে পেয়ে সেলিনা চিৎকার করে ওঠে । সেলিনা সোনা মিঞার মৃত দেহ দেখে চিৎকার না করে তুচ্ছ দু'আনার পয়সাটি দেখে কেন চিৎকার করে উঠলো তার ব্যাখ্যায় আম মৌলবি জানায়--

''.....হতভাগা ? সোনা মিঞার রক্তাপ্লুত দেহটি অতি বীভৎস দেখালেও ফেরেশতার মত নির্মলচিত্ত সেলিনা সে - দৃশ্যে বিচলিত হয় নাই, কারণ নির্দোষ মানুষটি ততক্ষণে বেহেশতে পৌঁছে গেছে । .....খুনীকে দেখেও মেয়েটি ভয় বা ঘৃণাবিতৃষ্ণা বোধ করে নাই কারণ, সেও নির্দোষ । কিন্তু মুদ্রাটির ওপর চোখ পড়তেই সেলিনা মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে শয়তানের জিনিস বলে চিনতে পারে । শয়তানের সে - অস্ত্রটির জন্যেই কি অতিশয় শোচনীয় ঘটনাটি ঘটে নাই?''[১৫]

সেলিনা কেন বিলম্বে চিৎকার করে উঠছিল তার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকলেও আম - মৌলবির ব্যাখ্যাটিই সকলের মনে ধরে । এমনকি ব্যাখ্যাটি গোপনে গোপনে সেলিনার মনকেও প্রভাবিত করে । আসলে মানুষ তাই বিশ্বাস করে যা সে বিশ্বাস করতে চায় । গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই আম- মৌলবি সকলের মনে এই বিশ্বাস জাগায় যে

সেলিনাকে ভূতে ধরেছে । তাই ভূতের হাত থেকে বাঁচতে সেলিনার মাথার সুন্দর চুল কেটে ফেলা হয় এবং গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাবিজ ।

প্রকৃতপক্ষে গল্পে সেলিনাকে উপলক্ষ্য করে গোঁয়ো কপট মোল্লাদের শঠতার এক নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । এই কপট মোল্লারা মানুষের শিশুসুলভ সারল্যের সুযোগ নিয়ে সমাজ জীবনকে অসুস্থ করে তোলে আবার তারাই স্ব-সৃষ্ট রুগ্ন সমাজকে সুস্থ করার দ্বায়িত্ব নেয়। যার পরিণতিতে সমাজ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। উপরোক্ত গল্পগুলোতে ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন ধর্মীয় কুসংস্কারের দিকটি তুলে ধরেছেন তেমনি আবার তাঁর কিছু গল্পে আশার বাণীও শুনিয়েছেন । তিনি আশা করেছেন এই দুর্দিন কাটিয়ে মুসলিম সমাজ একদিন ঘুরে দাঁড়াবে । 'চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে', 'নকল', 'স্বপ্নের অধ্যায়' তিনটি গল্পেরই মূল বক্তব্য প্রায় এক । তিনটি গল্পের চরিত্ররাই বাঙালি মুসলিম সমাজের দুর্দশা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত, আর সকলেই আশা করেছেন নিশ্চই এমন এক দিন আসবে যখন এ তিমির কেটে যাবে । যেমন 'নকল' গল্পে আফিয়ার বাবা বলেন--

''তোমরা একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান । তোমরা আমাদের থেকে অনেক মুক্তি পেয়েছো। অনেক কুসংস্কার থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছ। .....আমরা জেগে উঠছি । আমাদের আমলে যতটা না জেগেছি ততটা জেগেছি তোমাদের আমলে ।''[১৬]

শুধু ছোট গল্পেই নয় সৈয়দ ওয়লীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসেও ধর্মীয় কুসংস্কার কীভাবে নিঃশব্দে বাংলাদেশের মাটি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরেছেন । তাই 'লালসালু'-তে মাজার - পির -মোল্লা শাসিত মুসলমান গ্রাম সমাজের অধঃপতিত রূপটির পরিচয় মেলে । ভন্ড পীর - মোল্লাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামন্তবাদ । এদের কার্য পদ্ধতি আলাদা হলেও উদ্দেশ্য এক, নিরীহ গ্রামবাসীকে শোষণ করা । তাই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই --

''জীবন স্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কি করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্টো দিকে যাওয়া সম্ভব নয় । একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি - জোতের প্রতিপত্তি । সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা- পথ তাদের এক।''[১৭]

আর শ্রেণিবিভক্ত সামন্তবাদী সমাজে তাদের সে - পথ হলো শোষণের, শাসনের, নির্যাতনের-নিষ্পেষণের । তাই ঔপন্যাসিক একটি ভুয়ো মাজার ও তার খাদেমের উপর যে তীক্ষ্ণ আলো ফেলেছেন তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার জনজীবনের একটি বিরাট অংশ ।

ওয়ালীউল্লার প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ -তে ধর্মীয় কুসংস্কারের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’-তেও সে বিষয়টি কিছুটা উঠে এসেছে । যদিও এটি একটি সম্পুর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা । উপন্যাসে বড় বাড়ির দাদা সাহেব যেন মজিদেরই একটু ভিন্ন সংস্করণ। তিনি আমরিকায় কোনো নিগ্রো মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফকির- মিসকিনকে জিয়াফত খাওয়ান, কিন্তু খুনি ও লম্পট ভাই কাদেরকে ঠিকই সমাজে দরবেশ হিসেবে চালিয়ে জান ! যুক্তিহীন ধর্মীয় উন্মাদনাকে তিনি এ উপন্যাসেও কটাক্ষ করেছেন । দাদাসাহেব চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ বাঙালি মুসলমান সমাজের যে একটা দিককে বিশেষভাবে বিদ্রুপ করতে চেয়েছেন তা হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের উদ্ভট ঐতিহ্যবোধ । বহুদূরের ইরান-তুরান-খোরাসান-সিকিলিয়েহ-বালারাম-বাগদাদ-দামাস্কাস-কুর্তুবা-গ্রানাদার-সে খুন্দ প্রসাদ, বাবউজ্জহারের সোনালী তোরণ, মেনিনাত-উল-হামরা, নীলনদ তীরে কাছের-উল-খাবরী নিয়ে যে পলায়নী ঐতিহ্যবোধ-পূর্ববঙ্গের জলেকাদায় নিত্য জীবনসংগ্রামে রত কৃষিজীবী বাঙালি মুসলমানের বাস্তব অস্তিত্বে এ ধরণের ঐতিহ্যবোধ শুধুমাত্র পরিচয় সঙ্কটটাকেই তীব্র করে । এ ঐতিহ্যবোধ মৃত এবং ভূঁয়ো ।

প্রকৃতপক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্তের নিষ্প্রাণ জীবন, আশরাফ- আতরাফের ব্যবধান, মুসলমান নারীর একঘেয়ে , বৈচিত্র্যহীন, অবরুদ্ধ জীবন, মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ, সতীনের সঙ্গে সতীনের ব্যতিক্রমী সম্পর্ক, উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের হাহাকার, বনেদী মুসলমানদের আত্মঘাতী অহংকার, ধর্মব্যবসায়ী, ভন্ড, কাঠ-মোল্লাদের শঠতা, মুসলমান গাড়োয়ান আর ঘোড়ার আস্তাবলের চিত্র, সর্বোপরি ব্যক্তির অন্তর্জীবনের জটিলতার চিত্র যা বাংলার মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতরকার চিত্র । যে চিত্র এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল । তিনি বাংলা সাহিত্যের সেই অভাব পূরণ করেছেন যে অভাব দীর্ঘদিন যাবৎ বোধ করেছেন বাংলা ভাষার পাঠকগণ ।

‘লালসালু’ বাঙালি পাঠকের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল । উপন্যাসটির সূচনাতেই পাঠক এতদিনের অভ্যস্ত জগৎ ছেড়ে এক নতুন জগতে প্রবেশ করে। ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পাঠকের খুব বেশি অসুবিধা হয় না যখন তিনি উপন্যাসটি পড়তে শুরু করেন । কারণ লেখক শুরুতেই এর বীজ বপন করে রেখেছেন । মজিদের গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে--

“..................বিরান মাঠ, সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত । নদীগহ্বরেও জমি কম নেই ।

সত্যি শস্য নেই । যা আছে তা যৎসামান্য । শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি । ভোরবেলা এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ । ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে । গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্‌জ করা সারা । সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে । হাফেজ তারা । বেহশ্‌তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট ।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ । শস্যশূন্য । শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য । সেই হচ্ছে মুশকিল । এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্টভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে । শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে । তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে । শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না । কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে । বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে । কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে । চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই । অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে ।

তবু আশা, কত আশা । খোদাতা’লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা । দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায় । কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে-চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে । খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে । মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণো পাথরের খন্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে আবার পরে । কিন্তু শান্তি পায় না । মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায় ।”[১৮]

‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।’ এই চরম বাক্যটিই এ উপন্যাসের সারকথা । ধর্মই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় । জীবনের অন্য কোন মৌলিক প্রয়োজনের

এখানে কোন দাম নেই । অন্তত মজিদের মত ভন্ড মৌ-লোভী রুপি মৌলবিদের কাছে । নিজের আখের গোছানোর জন্যই এক-সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে মজিদ তাই প্রবেশ করে মহব্বতনগর নামে এমন একটা গ্রামে যে গ্রামের লোকগুলো ইদানিং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে । জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই উৎরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে । মুখে চিকনাই হয়েছে । জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামের বাইরে ভগ্নাবস্থায় পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত কবরকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে গ্রামবাসীর সামনে ঘোষণা করে ধর্ম ব্যবসার এক সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হয় মজিদ । লোক সমক্ষে সে ঘোষণা করে স্বপ্নাদেশ পেয়ে পীরের মাজারের খেদমত করার জন্য গারো পাহাড়ের স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে এই মহব্বতনগর গ্রামে এসেছে ।

‘‘- আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ ।- মজিদ বলে । বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল । গোলাভরা ধান, গরুছাগল । তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর । তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যে অমন বিদেশ-বিঁভুই-এ সে বসবাস করছিল । তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো । খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচিন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে । সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে । মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ সে-দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে-বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।’’[১৯]

মজিদ জানত দুনিয়ায় স্বচ্ছলভাবে দু-বেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচবার জন্য যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা অতি সাংঘাতিক । মনে তার ভয়ও ছিল । কিন্তু জামায়েতে উপস্থিত লোকেদের অধোবদন চেহারা দেখে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝতে পেরেছিল যে এই সকল সহজ-সরল গ্রামবাসীদের বশ করা খুব একটা কঠিন নয় । তাই লজ্জিত গ্রামবাসীদের র্ভৎসনা করে বলতে পেরেছিল-

‘‘ -- আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্ । মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন ?’’[২০]

একটি অচেনা-অজানা কবরকে মজিদ ইট-সুরকি দিয়ে সদ্যমৃত কোন মানুষের কবরের মত নতুন করে তোলে । ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত করে দেয় । দিন-রাত সকল সময়ে

মোমবাতি, আগরবাতি জ্বলতে শুরু করে । ধীরে ধীরে মজিদের মাজারের কথা চারদিকে প্রচারিত হতে শুরু করে । আর সেই সঙ্গে বদলে যেতে থাকে লাগল মজিদের জীবন-যাত্রা--

''এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগল । তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন । তার সঙ্গে পয়সা - ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল । বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হল, গৃহস্থালি হল । নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালুকাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে-জীবন পদে পদে এগিয়ে চলল । হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয় । সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয় । বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট।''[২১]

তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো যে সে ভাবিত হয় না তা নয় । কিন্তু তারও যে বাঁচার অধিকার আছে সে-কথাটাকেই নিজের কৃতকর্মের পেছনে সাফাই হিসেবে ব্যবহার করে । তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড়-বের-করা দিনের কথা স্মরণ করেও সে শিউড়ে ওঠে । এত নির্ভার জীবন ছেড়ে সেখানে ফিরে যাওয়ার চিন্তা সে কল্পনাতেও আনতে পারে না । শুধু ভাবে, খোদার বান্দা সে, নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ । তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন । তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন । মজিদের এ ভয়ংকর খেলায় যোগ দিল আরও এক গ্রামবাসী । তিনি খালেক ব্যাপারি । এদের দুজনেরই উদ্দ্যেশ্য নিরীহ গ্রামবাসীকে শোষণ করা । আর তাদের এই উদ্দেশ্য পূরণে যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে তাদেরকে তারা সমূলে উৎখাত করেছে । তবে উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই খালেক ব্যাপারির তুলনায় মজিদকে অধিক সক্রিয়ভাবে দেখানো হয়েছে । কারণ এ উপন্যাসের কাহিনি , প্লট সবই আবর্তিত হয়েছে মজিদকে কেন্দ্র করে ।

প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসীদের প্রতি নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য মজিদ কোন সুযোগই হাতছাড়া করে না । স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে সে হাসুনির বৃদ্ধ বাবাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয় । বয়স্ক বাবা ছেলেকে দিনে-দুপুরে সকলের সামনে খৎনা দেয় । সে তার তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্রাজ্যে কাউকে

বিন্দুমাত্র ভাগ বসাতে দিতে রাজি নয় । তাই ধান কাটার সময়ে যখন আশে-পাশের গ্রামে জাঁদরেল পীররা আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে । ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য কোন ব্যক্তি এসে যে-বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে । আর এই শঙ্কা থেকেই আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে মহব্বতপুরের লোকের কাছে ভণ্ড বলে প্রমাণিত করে । সে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই মানতে রাজি নয় । তাই তার শত চেষ্টার পরেও যখন খালেক ব্যাপারির স্ত্রী আমেনা বিবি আওয়ালপুরের পীরের ওপর আস্থা রাখে, আর খালেক ব্যাপারী তাকে সমর্থন করে তখন মজিদ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাদের আক্রমণ করে । অথচ আমেনা বিবির দোষ এমন কিছুই গুরুত্বর ছিল না । সে ছিল খালেক ব্যাপারির প্রথমা স্ত্রী । সতের বছরের বিবাহিত জীবনেও সে নিঃসন্তান । আবার চোখের সামনে তারই সতীন তানু বিবির কোলে প্রত্যেক বছর 'আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না' ।

তাই আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমনের সংবাদ পেয়ে তার মনে আশার সঞ্চার হয় যে এবার হয়ত তার মনের আশা পূরণ হবে । স্বামী খালেক ব্যাপারির কাছে আব্দার করে তিনি যেন আমেনা বিবিকে পীর সাহেবের কাছ থেকে পানি পড়া এনে দেন । কারণ আমেনা বিবির বিশ্বাস পীর সাহেবের পানি পড়া খেলে তার কোলেও তানু বিবির মতো ফুটফুটে সন্তান আসবে । খালেক ব্যাপারি মজিদকে মনে মনে ভয় পেলেও স্ত্রীর কথাও ফেলতে পারেন না । তাই অনেক ভেবে চিন্তে সে এই পানি পড়ার দ্বায়িত্ব দেয় তানু বিবির ভাই ধলামিঞাকে। ধলামিঞা খালেক ব্যাপারির বাড়িতেই থাকে । খালেক ব্যাপারি ধলামিঞাকে রাতের অন্ধকারে গোপনে আওয়ালপুর থেকে পানি পড়া আনতে বলে । কিন্তু ভিতু ধলামিঞা ভূতের ভয়ে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গদের ভয়েও বটে, আওয়ালপুরে যাওয়ার পরিবর্তে গোপনে মজিদের কাছেই যায় পানি পড়া আনতে । তার ইচ্ছা ছিল মজিদের কাছ থেকে পানি পড়া নিয়ে খালেক ব্যাপারির কাছে তা পীর সাহেবের পানি পড়া বলে চালিয়ে দিতে । তার এই অতি চালাকির কারণে মজিদের কাছে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায় । মজিদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে আমেনা বিবির ওপর । প্রতিশোধের আগুনে আমেনা বিবিকে সাপের মতই তীব্র ছোবল মারে সে--

''ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা । এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে । তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে

তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারার জন্য । আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে । সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য । তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ । সুন্দর পা-দেখে স্নেহ-মমতা না উঠে এসে, আসে বিষ । স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ করে জেগে উঠত তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালুকাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত । এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো-হাওয়া রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে-যেখানে কাদামাটি লাগে নি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না ।''[২২]

মজিদের ষড়যন্ত্রে শেষপর্যন্ত আমেনা বিবি কলঙ্কের কালি মুখে নিয়ে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয় । মজিদ ধীরে ধীরে সকল গ্রামবাসীকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে শুরু করে । এ বিষয়ে তার আরেকটি পদক্ষেপ গ্রামে বিদ্যালয় তৈরি-তে বাধা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসীদের চিন্তা-ভাবনার পথটাও সে রুদ্ধ করে দিতে চায় । সে চায় না গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক । তাই মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস যখন গ্রামে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চায় তখন মজিদ অত্যন্ত সুকৌশলে আক্কাসের এ প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয় । খালেক ব্যাপারিকে সঙ্গে নিয়ে সে গ্রাম্য সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে বিদ্যালয় থেকে মসজিদ নির্মাণের দিকে নিয়ে যায় । আর নিরক্ষর ধর্মভীরু গ্রামবাসীদের কাছে বিদ্যালয় নির্মাণ অপেক্ষা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব যে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে একথা বলাই বাহুল্য । উপন্যাসে ঘটেছেও তাই -

''কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, - ভাই সকল । পোলা মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে-তা নিয়া আর কী কমু । দোয়া করি তার হেদায়েত হোক । কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি । খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো । বড় আফসোসের কথা, গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই । খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে । এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না ।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয় । আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে-এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে । কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল । ব্যাপারির নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

- বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন !

মজিদ খুশিতে গদগদ । দাঁড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে । আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই । আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয় ।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন- আমাগো মনের কথাডাই কইছেন । এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

-তয় ইস্কুলের কথাডা ?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় । তার বাপ তো রেগে ওঠে । রাগলে লোকটি কেমন তোতলায় । ধমকে তো তো করে বলে,

-চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না । মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে ।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না । যে-গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ।'[২৩]

এভাবেই শিল্পীর নিপুণ দক্ষতায় মজিদ একের পর এক প্রতিরোধের দেওয়াল ধ্বংস করে দিয়েছে । কিন্তু তবুও সে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না । মজিদের ব্যর্থতা ও দৈন্যের চিত্র প্রকাশ হয়ে পরে তারই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলার কাছে । কিশোরী জমিলা যৌবনের প্রতীক, উচ্ছ্বলতার প্রতীক, মুক্ত চিন্তার প্রতীক । উজ্জ্বল যৌবন নিয়ে বয়ঃসন্ধি-কালের কিশোরী অনভিজ্ঞ জমিলা আর পাঁচটা কিশোরী মেয়ের মতোই স্বামীর প্রেম-প্রীতি প্রত্যাশা করেছিল । কোন ঐশী লোকের ভয় তার নেই । সে কবর বোঝে না, মাজার বোঝে না - সে চায় স্বামীর ভালোবাসা । অন্য দিকে মজিদ কেবলই তাকে ভোগের সামগ্রী করতে চেয়েছে । কারণ রহিমা তার যৌন-কামনাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি । কিন্তু জমিলাকে মজিদ যতই নিজের

নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ততই জমিলা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী । জমিলার এই একগুয়ে, জেদি আচরণে মজিদ ক্রমশ বিপন্ন, বিব্রত ও বিপর্যস্ত বোধ করে । মহব্বতনগরের কোন ব্যক্তির যেখানে মজিদের নির্দেশ আমান্য করার সাহস নেই সেখানে জমিলার এই আচরণ স্বাভাবিকভাবেই মজিদের কাছে অপ্রত্যাশিত । জমিলাকে তাই সে সর্ব শক্তি দিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করে, বলে--

'' - তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ । তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব । তোমার দোষ কী ?
জমিলা শোনে, কিছু বলে না । মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কী শক্ত গুনার কাম জান নি, ক্যামনে করলা কামটা ? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আঁগরে কি ডরাও না ?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব । কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা ।
- তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি ! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষরে শান্তি দেয়, সুখ দেয় । তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না ।''[২৪]

মজিদের এই কড়া নির্দেশেও জমিলার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না । সে নামাজ পড়তে পড়তে জায়নামাজের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে । ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে । তারপর সহসা আবার সে চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে । একথা অন্তত অনুভব করতে পারে - নামাজ পড়তে পড়তে যার চোখে ঘুম চলে আসে তার মনে অন্তত খোদার ভয় নেই । মনে খোদার প্রতি নিদারুণ ভয় থাকলে নামাজ পড়ার সময় মানুষের কখনো ঘুম আসতে পারে না । এবং এত করেও যার মনে খোদার ভয় জাগে নি, এবার তাকেই ভয় হতে থাকে মজিদের । ক্রোধে সে গোঁ গোঁ করতে থাকে । হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে এক হ্যাঁচকা টান মেরে জমিলাকে বিছানার উপর বসিয়ে দেয় । এরপর আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাজারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে । কিন্তু মাঝ-উঠানে পৌঁছে হঠাৎ বেঁকে বসে জমিলা । মজিদের টানে এতক্ষণ সে স্রোতে ভাসা তৃণখন্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল । এবার সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্ঠি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল । অনেক চেষ্টা করেও যখন সে

ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভূত একটা কান্ড করে বসল । হঠাৎ সিধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করল ।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে । মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক, পর হোক কেউ তার হুকুম এভাবে অমান্য করেনি কোন দিন । আজ তার ঘরের একরত্তি বউ-যাকে সে সেদিন মাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে-সে কিনা এমন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে । ঘটনার আকস্মিকতায় মজিদ হতবুদ্ধি হয়ে যায় । হঠাৎ করেই সে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে ।

মজিদের প্রতি জমিলার এই ঘৃণাবোধ মজিদকে আরও নির্মম করে তোলে । পরবর্তীতে এক জিকিরের রাতে জমিলা ভরা মজলিসে উপস্থিত হলে পীরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে মজিদ আবারও জমিলার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । শাস্তি হিসেবে সে জমিলাকে তারাবি নামাজ পড়া এবং তারপর মাজারে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেয় । কিন্তু বিদ্রোহী জমিলা এ শাস্তি মানতে চায় না । মজিদ এবার জমিলাকে তাই চরম শাস্তি দেয়--

''জমিলাকে সোজা মাজার ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ । ঘর অন্ধকার । বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না । এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার ; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই । খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে । কিন্তু সে দেখে না কিছু । কেবল মনে হয় চোখের সামনেই অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে ।

.....

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ । এই সময় সে বলে, - দেখ, আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর । আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই । এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা । আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে । না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন

তোমার দিলে একটু পাশেমানির ভাব জাগল না ? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে ?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল । মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে । তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

-তোমার জন্য আমার মায়া হয় । তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে । কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয় । কিন্তু তোমারে আমি এইসব করুম না । কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব । কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই ।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে । কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

-ঝাপটা দিয়ে গেলাম । কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না । দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও ।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেল ।'[২৫]

মাজারের ঝাপ বন্ধ করে দিয়ে মজিদ ভেতরের ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকে এই আশায়-যে কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে । কিন্তু নিজের শ্বসনকে প্রায় নিঃশব্দ করে তুলেও মজিদ ও ধারে কোন আওয়াজ পায় না । আরো সময় কাটে, এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয় । তার পর দূর আকাশে মেঘ গর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের পানে । যে রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা, সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তুপ । থেকে থেকে বিজলী চমকায়, আর শীঘ্র ঝিরঝির শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে । আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে বসে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে । আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে । রাতও কাটি কাটি করে কাটে না, তারপর হঠাৎ

ঝড় আসে । দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায় থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর । মজিদ উঠে আসে ভেতরে । ভাবে ঝড় থামুক । কারণ আর দেরি নয়, মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে । এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক কোনো লক্ষণ দেখা যায় না । ঝড়ের পরে আসে জোরাল বৃষ্টি অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে । তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি । রাতের এই উদ্দাম ঝড় শিলাবৃষ্টি শেষে রহিমার কথায় মজিদ মাজার থেকে জমিলাকে আনতে যায় । আনতে গিয়ে মাজারের ঝাপ খুলে মজিদ যা দেখতে পায় তা এই --

''ঝাপটা খুলে মজিদ দেখল , লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই । চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয় । আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে । পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না ; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না । সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে আসে ।''[২৬]

জমিলার 'মেহাদি দেয়া.. একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে' - থাকা মজিদের দীর্ঘদিনের প্রভুত্বের বিরূদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ । যে মাজারের সামনে এসে ধর্মভীরু জনগণ বিনয়ী হয়, চুম্বন করে, কবরের পদপ্রান্তে এসে শ্রদ্ধায় নিজেকে বিলীন করে দেয়- সেই কবরে জমিলার পা মজিদের এতদিনের নির্মিত অস্তিত্বে ফাটল ধরিয়ে দেয় । মজিদের প্রতি জমিলার এই নির্মম প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও মজিদের অন্তর্জগতে তার প্রভাব অসহ্য যন্ত্রনাদায়ক ও অবর্ণনীয় । কিন্তু এ দৃশ্যের মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মূলত মুক্তবুদ্ধির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির স্বপক্ষে একটি প্রত্যয়বান শিল্পকর্ম তুলে ধরতে চেয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে পরলৌকিক অনিশ্চয়তাজনিত ভীতি এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে পুঁজি করে অর্ধশিক্ষিত চিত্তসম্বলহীন অভিনয় দক্ষ চতুর শঠ প্রকৃতির মানুষজন কীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে মজিদ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিকতার সাথে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । মহব্বতনগরের চিত্রে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের ধর্ম ব্যবসার আসল রূপটি যেভাবে সামনে এনেছেন বাংলাসাহিত্যে এমনতর দুঃসাহস আর কেউ সেভাবে দেখাতে পারেননি । তাই 'লালসালু' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার ষাট বছর অতিক্রান্ত হলেও তা আজও সাব অল্টার্ন মুসলমান সমাজের রূপরেখায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক । মুসলমান

সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক অপরিবর্তনীয় জীবন যাপনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই নির্মাণ মূলত মুসলমান সমাজের রহস্যগভীর জীবনেও অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে । যা সময়ানুগ, তির্যক, ইঙ্গিতময়, মনস্তত্ত্ব সম্মত এবং সর্বোপরি আধুনিক ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে যেভাবে মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'-তে তা পাওয়া যায় না । অবশ্য তার কারণও রয়েছে । বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি দুটি উপন্যাস সম্পূর্ণভাবেই একে অপরের থেকে আলাদা । 'চাঁদের অমাবস্যা' মূলত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, যেখানে সমাজচিত্র খুব কমই স্থান পেয়েছে । তার পরেও উপন্যাসে বর্ণিত দাদাসাহেব চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক ধর্মান্ধতার বিষয়টি খুব স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের বড় বাড়ির মুরুব্বি দাদাসাহেব যেন মজিদেরই একটু ভিন্ন সংস্করণ । তাঁর পরিচয় দিয়েছেন লেখক এভাবে--

''দাদাসাহেব বড় বাড়ির প্রধান মুরুব্বি । দীর্ঘ প্রশস্ত মানুষ প্রৌঢ়-বয়সেও মুখভরা একরাশ কালো দাড়ি । তবে চুল-গোঁফ সুন্নত অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা ।

বছরপাঁচেক হল দেশের বাড়ির বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন । তার পূর্বে তিনি সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে কেবল ছুটি-ছাটাতেই দেশে আসতেন । সারা জীবন চাকুরি করেছেন বটে কিন্তু চাকুরিতে কখনো মন ছিল না ! মাজ্‌হাব-শরিয়ত ব্যাপারে সর্বদা মশগুল থাকতেন বলে কর্মজীবনেও বিশেষ কৃতকার্য হন নাই । উপাধি-ইনাম তো দূরের কথা, পদোন্নতিও বিশেষ হয় নাই । অবশ্য সে-জন্য সেদিনও তাঁর কোন আফসোস ছিল না, আজও নাই । বরঞ্চ চাকুরিজীবন শেষ হলে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন : অবশেষে তিনি নিজের সময়ের ষোল আনা মালিক হলেন, তাতে কারো হিস্‌সা-দাবি থাকল না। তাছাড়া, এবাদতে এবং মাজ্‌হাবি কাজে সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ দেবার পথে আর কোন বাধা থাকল না ।

অন্য একটি কারণেও চাকুরি জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না । সে-জীবন পরাধীন যুগে কেটেছে । পরাধীনতার অবমাননা যতটা তাঁকে কষ্ট দেয় নাই ততটা দিয়েছে মনিবের বিধর্মীয়তা । বিধর্মীয় মনিব তাঁর প্রিয় ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে কোনো বিরোধিতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও তার সে-বিরোধিতা-অবজ্ঞা অহরহ অনুভব করেছেন । এমন মনিবের অধীনে গোলামি করা নিতান্তই পীড়াদায়ক । অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই ।

দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি অবিলম্বে এ-কথা বুঝতে পারেন যে, অবসর গ্রহণ সময়োচিতই হয়েছে । বাড়িতে সংখ্যায় দশাধিক বালক-বালিকা । তাঁর গ্রামবাসী বড় ছেলের ছয়টি ছেলেমেয়ে । বিধবা মেয়েরও পাঁচটি সন্তানসন্ততি । তাদের শিক্ষাদীক্ষার একান্ত প্রয়োজন । সে-শিক্ষাদীক্ষা হেলা করা যায় না । তবে ভাগ্য ভালো, এখনো তাদের মন সার-দেয়া জমির মতো । তাতে যে-বীজ বপন করা যাবে সে-বীজই ফলবতী হবে ।

প্রথম সপ্তাহে তিনি নির্দেশ দিলেন, বিস্‌মিল্লাহ্‌ না বলে কেউ যেন লোক্‌মা না তোলে । শীঘ্র আরেক হুকুম হল, কারো একটি নামাজ যেন না কাজা না হয় । (অবশ্য একেবারে নামাজ না পড়া কল্পনাতীত।) তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তস্‌বি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন । মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন ঘটল যে ঝানু মোল্লামৌলবিদেরও তাক লেগে গেল । মাথা নেড়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, দাদাসাহেব অসাধ্য সাধন করেছেন ।''[২৭]

বড় আশ্চর্য চরিত্র এই দাদাসাহেব । তিনি নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম বলে মনে করেন । তাই দূর অচেনা কোন দেশ আমেরিকায় কোন নিগ্রো মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি তিন গ্রামের ফকির মিসকিনকে জিয়াফত খাওয়ান । পৃথিবীর কোথায় কোথায় মুসলিম ধর্মের পতাকা উত্তোলন হয়েছে তা গর্বের সঙ্গে সকলকে জানান । কিন্তু ইতিহাসের কথা দাদা সাহেব কখনো বলেন না । কারণ ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি । আর মানুষের সৃষ্টির কথা তুললে ভালো খারাপ দুয়েরই কথা ওঠে । দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র মহৎ খলিফা ওমর বা রশিদ মামুনের কথা তুললে পাশাপাশি ইয়াজিদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-ময়তাওয়াক্কিলের নৃশংসতা, হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না । কখনো কখনো দাদাসাহেব গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবেন, দ্বিতীয় দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কী করে তাদের কথা ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় ? তাদের কথা ভাবলে কোন কোন সময় তার হৃদ্‌কম্পনের মত ভাব হয় । শুষ্কহৃদয়ে ভাবেন, নির্দয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নাকি নিজেই পনের হাজার মানুষের মস্তকচ্যুত করেছিলেন । একটি বা দুটি নয়, পনের হাজার মানুষ । ওবাইদুল্লাহ বিনজিয়াদ জল্লাদ নাম অর্জন করেছিলেন তার নিষ্ঠুরতা এবং হিংস্রতার জন্য । ইতিহাসের কথা তুললে এদের নাম কি এড়ানো যায় ? যে দাদা সাহেব ভালো-মন্দ সম্বন্ধে এত সচেতন সেই দাদাসাহেবই কিন্তু আবার সমস্ত জেনে বুঝেও নিজের খুনি ও লম্পট ভাই কাদেরকে

সমাজে দরবেশ হিসেবে চালিয়ে যান । শুধু তাই নয় কাদেরকে বাঁচাতে যুবতী খুনের দায়ও গরীব, আশ্রিত শিক্ষক আরেফ আলীর ওপর চাপানো হয় ।

এতদূর অবধি পড়ে অনেক পাঠকের মনে হতেও পারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের খারাপ দিকটাই দেখিয়েছেন । অনেকে আবার এরকম হাস্যকর যুক্তিও দেন যেহেতু তিনি ছোট বেলায় 'আরবি' বিষয়ে ফেল করে একই শ্রেণিতে দু'বার ছিলেন সেহেতু বরাবরই মোল্লা-মৌলবিদের প্রতি তাঁর একটা রাগ থেকেই গিয়েছিল । সেই রাগ থেকেই তিনি নাকি বার বার মৌলবিদের বিরূদ্ধে কলম ধরেছেন । কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মত একজন উচ্চ শিক্ষিত মার্জিত ব্যক্তির বিরূদ্ধে এই যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর নয় কি ? তাঁর সম্পর্কে লোকে আরও ভুল ধারণার অবকাশ পায় কারণ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মীয়ভাবে মুসলিম ছিলেন না । মুসলিম ধর্মের কোন ব্যবহারিক দিক তিনি দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলতেন না । হ্যা, একথা ঠিক ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয়ভাবে তিনি মুসলিম ছিলেন না । কিন্তু পূর্বেই বলেছি ধর্মীয়ভাবে না হলেও সংস্কৃতিগত ভাবে তিনি ছিলেন মুসলিম । অ্যান মারী ওয়ালীউল্লাহ্ জানিয়েছেন -

''.....ধর্মীয়ভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সে বাঙালি মুসলমানই ছিল । সেভাবেই সে বেড়ে উঠেছে । দেশকে সে গভীরভাবে ভালোবাসত । পূর্ব বাংলার সৌন্দর্য, অজস্র আঁকাবাকা নদী সবুজ ক্ষেত, তরুবিথীর পেছনে ঢাকা পড়া ছোট গ্রাম, বাঁশঝাঁড়, কাঁঠালগাছ, দামাল মেঘ, দমকা বাতাসের সঙ্গে মৌসুমী বৃষ্টিতে বেড়িয়ে পড়া শিশু কিশোরের দল -আমাকে এসব দেখানোর জন্যে সে উদ্‌গ্রীব ছিল । আমাকে সে বৃষ্টির দিন নিজ হাতে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ার গল্প শুনিয়েছিল । আমাকে সে শুনিয়েছে কত্থক নাচ, মোঘল রাজ দরবার, মোঘল সম্রাটদের বানানো অপূর্ব সুন্দর সব প্রাসাদ, তাদের উচ্চমানের সংস্কৃতির কথা এবং একই সঙ্গে তুলনা টেনেছে ইউরোপের সঙ্গে তাদের জীবন যাত্রার, নিজের দেশের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, দেশটিতে বৃটিশ, হিন্দু জমিদার এবং পাকিস্তানিদের শোষণকে ঘৃণা করত সে । সে আমাকে বাংলার লোক কাহিনি শোনাত, বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস বর্ণনা করত, সে শোনাত সেই সব মুসলমান তাঁতিদের কথা, যাদের নামে সূক্ষ মসলিন কাপড়ের নামকরণ হয়েছে । সে বলত মসলিন শিল্প ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কীভাবে ইংরেজরা তাঁতিদের হাতের আঙ্গুল কেটে দিত, বলত নীল বিদ্রোহের কথা, সে বলত, মুসলমানরা বৃটিশদের এত ঘৃণা করেছে যে, তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে লেখা পড়া করতে পাঠায়নি, বৃটিশ

শাসকদের কোন রকম সহযোগিতা করে নি, তারা আশ্রয় নিয়েছে ধর্ম কর্মের কাছে আর এ কারণে তার মুসলমান-সমাজ পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত হয়েছে, এদিকে মুসলমানদের সরে দাঁড়ানোর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায় । দেশভাগের সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন ও কলকাতায় ছিল । সেখানে ও যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ দেখেছে, সে গল্প ও আমাকে শুনিয়েছে । বিদেশে থাকাকালে ওয়ালী তাঁর দেশ, তাঁর ঢাকার বন্ধুদের অভাব খুব বোধ করত । বাংলা বলতে না পারার অভাবও খুব অনুভব করত সে । করাচীতে কর্তব্য পালনের সময় সে এক প্রকার বাঙালিদের সঙ্গেই শুধু মিশত । প্যারীসেও প্রখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে । রাজেশ্বরী নিজে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী । ওয়ালী ওর বাঙালি বন্ধু সানাউল হক, নজমুল করিম, শওকত ওসমান, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম, মতিন, ওর জ্ঞাতি ভাই জহুর হোসেন এবং অন্যদের দাওয়াত দিতে পছন্দ করত । তাঁদের সঙ্গে ও বাংলার ভবিষ্যৎ, বেতন সাম্য, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ইত্যাদি নিয়ে রাত জেগে বাংলায় আলাপ আলোচনা করত । আমার মনে হয় মাঝে মধ্যে ওরা এমন এক স্বাধীন একীভূত বাংলার স্বপ্ন দেখত যে দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ থাকবে না। ওরা যখন বাংলার রাজনীতি নিয়ে অন্তহীন আলোচনায় জড়িয়ে পড়ত, তখন মনে হত , কেউ পানির কল খুলে দিয়েছে, অনর্গল দ্রুত উচ্চারিত শব্দের স্রোত বয়ে যেত তখন ।

.....

উপমহাদেশের লোকজনের সঙ্গে খেতে বসলে সে ওর বাঙালি কায়দায় আঙ্গুল দিয়ে ভারতীয় খাবার খেত । আমি ওর আঙ্গুলের প্রশংসা করতাম । মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতে পছন্দ করত ও । জাকার্তায় থাকতে বাড়িতে লুঙ্গি পড়ত । প্যারীসেও গ্রীষ্মকালে ও লুঙ্গিই পড়ত । বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ও আঙ্গুলের গাঁট গুনত । বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে সিগারেট খেত না । মামা-মামির পা ছুঁয়ে কদমবুসি করত । ও চট্টগ্রামের পুরী, চাপাতি, সব্জি পছন্দ করত । রুই মাছ, ঢাকাই পনির, উচ্ছে, আম, পশ্চিম পাকিস্তানের মিষ্টি কমলালেবু, বিশেষ করে সব ধরনের বাঙালি খাবার পছন্দ ছিল ওর । সুপারি চিবোত । আগে যেমনটা বলেছি, ও খিচুড়ি রান্না করত, ও ভাটিয়ালি পছন্দ করত । মাঝে মধ্যেই বাংলা গান গাইত । ওর পরিবার আমাকে বলেছিল অল্প বয়সে ওর ভালো গানের গলা ছিল ।'[২৮]

অ্যান মারীর এই বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংস্কৃতিগত ভাবে নিজেকে ঠিক কতটা বাঙালি বলে মনে করতেন । মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনি এক

অনগ্রসর জাতি হিসেবেই দেখেছেন । আর মন থেকে চেয়েছেন এই জাতির উন্নতি । সেই চাওয়া থেকেই তৎকালীন আর পাঁচটা মুসলমান তরুণের মতো সমর্থন করেছেন 'মুসলিম লীগকে' । অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার জন্য অগ্রনায়ক হিসেবে তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কেই মেনে নিয়েছিলেন । এ বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বক্তব্য কী ছিল তা জানার জন্য কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেয়ে ঋষিকেশ লাহিড়ীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেওয়াই যথেষ্ঠ । জিন্নাহ্‌ মারা যাওয়ার পর, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখের সেই চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌ লিখেছিলেন-

''কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয় । নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এযাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের একজন । কিন্তু তার মহত্ত্ব ছিল প্রধাণত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । তিনি ভারতবর্ষের তার স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন , সেখানে তার বড়ো মহত্ত্ব । গত দশ বছর যে তার জীবনের সবচেয়ে কীর্তিময় সময় ছিল এটা আপনিও মানবেন; এই সময়কালে তার সকল শক্তি ও মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল শুধু একটা লক্ষ্যের প্রতি : মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা । এর জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন এবং সফলও হয়েছেন । তিনি যা করেছেন সে জন্যে মুসলমানরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ ।''[২৯]

প্রকৃতার্থে মুসলিম ধর্ম নয়, ধর্মের বেশভূষা ধরে যে জালিয়াতি আর প্রতারণা চলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন । হয়ত যে কোন ধর্মকে নিয়েই তিনি তা করতে পারতেন । তবে যে ধর্মটিকে তিনি ভালো করে জানেন, যেটির ভেতর তিনি বেড়ে উঠেছেন, যেটিকে তার দেশের মানুষের পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্রের জন্যে দায়ী বলে মনে করতেন সেটির ক্ষেত্রেই বেশি করে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন । তাই ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলেছেন--

''আমার লেখা বই । আমার নাটক, আমার গল্পগুলো ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন নয়, বরং এগুলো তার চেয়ে বেশি কিছু । অন্তত আমি সেটাই মনে করি । আমি যখন ধর্মীয় কুসংস্কার, মোল্লাদের হাতে গরীব মানুষের শোষণকে আক্রমণ করি, তখন আমি গোটা ব্যবস্থাটাকেই আক্রমণ করি । [গুরুত্ব আরোপ ওয়ালীর নিজের] ''[৩০]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে শওকত ওসমান , আবু জাফর শামসুদ্দীন বা শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখ লেখকেরা যখন তাঁদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজকে সচেতন করার প্রয়াসী এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকের চেয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা বেশি নিয়েছেন তখন সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহ্ -র সেরকম কোন ঘোষিত কমিটমেন্ট না থাকলেও শিল্পের রসে জারিত করে তিনিও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে তাঁর মোক্ষম আঘাতটি হেনেছেন ।

তথ্যসূত্র :

১ সময়, নবম সংখ্যা, শীতকাল, ১৩৮৭

২ মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৬৬

৩ ওয়ালীউল্লাহ্, অ্যান মারী - আমার স্বামী ওয়ালী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৫৬,

৪ মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-১৪৪

৫ ঐ পৃ-১৪৫,

৬ আজাদ, হুমায়ুন - নারী, আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ, পৃ-১০০

৭ ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - পাগড়ি, গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ১৯৯৬, বাংলাদেশ, পৃ-৭৩

৮ ঐ পৃ-৭২

৯ ঐ পৃ-৭৬

১০ মৃত্যু, ঐ পৃ-২৬০

১১ ঐ, পৃ-২৬১

১২ ঐ পৃ-২৬১

১৩ বংশের জের, ঐ, পৃ-২৯০

১৪ ঐ পৃ-২৯১,

১৫ গ্রীষ্মের ছুটি, ঐ, পৃ-৯০

১৬ নকল, ঐ, পৃ-২৫১

১৭ ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - লালসালু, উপন্যাস সমগ্র, প্রতীক প্রকাশন, ১৯৯৬, বাংলাদেশ, পৃ-৩১

১৮ ঐ, পৃ-,৩

১৯ ঐ, পৃ-,৬

২০ ঐ,পৃ-,৬

২১ ঐ, পৃ-৭

২২ ঐ, পৃ-৩৯

২৩ ঐ, পৃ৪৬

২৪ ঐ, পৃ-৫৫

২৫ ঐ, পৃ-৬২-৬৩

২৬ ঐ, পৃ-৬৬

২৭ চাঁদের অমাবস্যা, ঐ, পৃ-৭৭-৭৮

২৮ ওয়ালীউল্লাহ্, অ্যান মারী - আমার স্বামী ওয়ালী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ-৩২-৩৬

২৯ মান্নান, সৈয়দ আব্দুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, অগ্রন্থিত রচনাগুচ্ছ অপ্রকাশিত আলোকচিত্রাবলি, অবসর প্রকাশনী, ২০০১, বাংলাদেশ, পৃ- ১৬৪

৩০ ওয়ালীউল্লাহ্, অ্যান মারী - আমার স্বামী ওয়ালী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৫৬,

---